আশাবরী

অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত সাময়িকপত্র

সম্পাদক : শিশিরকুমার মাইতি

আশাবরী

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

সম্পাদনা :
ড. শিশির কুমার মাইতি

সৎ নির্লোভ আদর্শবাদী আত্মপ্রচারবিমুখ সাহিত্যসেবী ধ্রুববিকাশ দাস গত ২২শে মে দুপুরে, ৭৪ বছর বয়সে স্বর্গবাসী হয়েছে। বন্ধু, স্বর্গলোকে সুখে থেকো।

৫১ বছর, ১৯৫তম সংখ্যা॥ অক্টোবর ২০১৫
অনুদান ঃ ৫০ টাকা, বার্ষিক ৮০টাকা (ডাকব্যয় স্বতন্ত্র)
দূরভাষ ঃ ২৬৬৭-৯৪৪২, ৯২৩০৪৫২৪৮৬
E-MAIL : ashabaripatrika@gmail.com
ASHABARI PAN CARD N0 : AAALA1434 G/21.3. 1968

এই সংখ্যার লিপিকার ঃ

সম্পাদকের আত্মদর্শন ॥ ২৫ ॥ ৩; অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৬; কোয়েল মল্লিক ॥ ২৬; পারমিতা ভৌমিক ॥ ৩৬; শিশিরকুমার মাইতি (ধারাবাহিক) ॥ ৪১; তরুণ মুখোপাধ্যায় ॥ ৭৩; পাবলো নেরুদা ॥ অনুবাদ ঃ মোঃ হামিদুল ইসলাম ॥ ৭৭; সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ॥ ৭৮; স্বপন নন্দী ॥ ৮৬ ; কালীপদ সামন্ত ॥ ৯৩; অংশুমান চক্রবর্তী ॥ ১০০; জহরলাল দে ॥ ১০১; সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১০৪; গঙ্গাধর মান্না ॥ ১০৫; গোরাচাঁদ দে ॥ ১১২; কুমার মিত্র ॥ ১১৩; বিশ্বজিৎ কর্মকার ॥ ১২২; গুরুদাস বাজানী ॥ ১২৩; শান্তনু সাহা ॥ ১২৬; দিব্যাংশু কুণ্ডু ॥ ১৩৯ ; মুকুল ভট্টাচার্য ॥ ১৪৫ ; দেবশ্রী ঘোষ। ১৫৫ ; প্রশান্ত সিংহ॥ ১৬৪; ডাঃ এল. এন. সামন্ত ॥ ১৬৫; অনুরাগী সহপাঠী ॥ ১৭১; কাজী হাবিবুর রহমান ॥ ১৭২; তাপস পালিত ॥ ১৭৩; গৌতমকুমার দে ॥ ১৭৪; ইতালী গুপ্ত ॥ ১৭৫

প্রচ্ছদ ঃ গুলজার হোসেন

আশাবরী

প্রকাশনা জগতের নমতম জ্যোতিষ্ক

Ashabari * Regd. No. 18285/68 * Annual Subscription 80/-

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক—সব কিছুর সমৃদ্ধ প্রকাশনা থাকলেও আশাবরী পাবলিকেশনের সুদূরব্যাপী খ্যাতির মূলে রয়েছে মননশীল প্রবন্ধ গ্রন্থের বিশাল সমাবেশ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস, সমীক্ষাপত্র, প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রকাশ করে আশাবরী ইতিমধ্যেই বুদ্ধিজীবীমহলে স্থান করে নিয়েছে। ডঃ শিশিরকুমার মাইতি'র সাম্প্রতিক প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রকাশনা ঃ

সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রেক্ষিতে বাংলা কথাসাহিত্য

লেখকের পূর্ব প্রকাশনা ঃ ১। প্রবন্ধ-সঞ্চয় (১৯৬৮) ২। পঞ্চশিখা (১৯৬৯) ৩। শতাব্দীর আলোকে শরৎচন্দ্র (১৯৭৬) ৪। পূজা রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৭) ৫। বিস্মৃতির অন্তরালে (১৯৮৭) ৬। সাময়িকপত্র ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৭) ৭। বিবিধ প্রবন্ধ (১৯৮৭) ৮। কিছু মত ঃ কিছু পথ (১৯৮৮) ৯। চরিতসুধা (১৯৮৮) ১০। বাংলা সাহিত্যে সামন্ততন্ত্র (২০০০) ১১। বিচিত্র প্রবন্ধ (২০০১) ১২। প্রবন্ধ সমুচ্চয় (২০০৪) ১৩। প্রবন্ধ সম্পুট (২০০৬) ১৪। প্রবন্ধ মঞ্জরী (২০০৮) ১৫। Feudalism in Bengali Literature [Research paper in English Rendering) Ist. Vol. (2009) ১৬। ঐ, 2nd Vol. (2011) ১৭। ঐ, 3rd Vol. (2014) ১৮। প্রবন্ধাঞ্জলি (২০১০) ১৯। পথের সঞ্চয় (২০১১) ২০। শেষ স্বাক্ষর (২০১৩) ২১। প্রবন্ধ বিন্যাস (২০১৪)

এই প্রকাশনার সুখ্যাত অন্য লেখকের আরও কিছু কালজয়ী প্রবন্ধের বই ঃ

❋ স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাই * তারাকালী বসু ১৯৯৪ ❋ এই কলকাতায় * অনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬ ❋ রবীন্দ্রনাথ ঃ নানা প্রসঙ্গ * অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৬ ❋ আত্মসংকট ঃ সমকাল * অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৬ ❋ তারাশঙ্করের উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষ * ডঃ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৭ ❋ জীবনানন্দ পরিক্রমা * অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৯৯ ❋ শ্রীরামকৃষ্ণ ঃ জীবন আলেখ্য * তারাকালী বসু ২০০০ ❋ ইতিহাসের রূপরেখা ঃ গ্রাম-জনপদ * তারাপদ সাঁতরা ২০০১ ❋ স্মৃতির আলোয় বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে * তারাপদ সাঁতরা ২০০২ প্রতিভার ইন্দ্রধনু স্বর্ণকুমারী দেবী * নিমাই দাস ২০০৩ ❋ তেভাগা আন্দোলনে হাওড়া জেলা * দুঃখহরণ ঠাকুরচক্রবর্তী ২০০৪ ❋ ইতিহাসের নকশিকাঁথা * অনুনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৫ ❋ The mind and work of Sarat Chandra Bose * Dr. Prabhas Chandra Roy 2006 ❋ Trinity * Dr. Apurba Sanyal 2006 ❋ শরৎচন্দ্র ও টমাস হার্ডি * ডঃ জীবন মুখোপাধ্যায় ২০০৭ ❋ টমাস হার্ডির অন্য চতুষ্টয় (প্রবন্ধগ্রন্থ) (২০০৯ ❋ বিতর্কিত মানিক শিবনারায়ণ এবং অন্যান্য * দেবী রায় ২০০৯ ❋ মরুগোলাপ * গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২) ❋ বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা * নিত্যানন্দ কুণ্ডু ২০১৩ ❋ ওমর খেয়াম * অমিতাভ ভট্টাচার্য (২০১৪) ❋ বঙ্গের দুর্গা সংস্কৃতি * অলোক কুণ্ডু ২০১৫ ❋ চিত্রীর গদ্য ও অবনীন্দ্রনাথ * ডঃ পায়েল বসু ২০১৫ ❋ হাওড়ার কবি ও কবিতা চর্চা * স্বপন নন্দী ২০১৫।

Edited & Published by Dr. Sisirkumar Maiti from 24, Thakur Ramkrisna Lane, Howrah - 711 104, Phone No. 2667 - 9442

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ

কোয়েল মল্লিক

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দুবাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"

(ভারততীর্থ কবিতা। সঞ্চয়িতা)

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানবতা' বোধের ধারণাটি পরিচয় আমরা তাঁর বহু রচনায়, কবিতায়, গানে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, প্রবন্ধে পরিস্ফুট হতে দেখি। এই ধারণাটি যেন তাঁর সমগ্র আত্মিক সত্তাটিকে প্রকাশ করে। তাঁর জীবনবোধ, ঈশ্বরের ধারণা, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার সম্পর্ক, ব্যক্তি মানবমনের সঙ্গে বিশ্ব মানবমনের সুনিবিড় সম্পর্কটি পরিপূর্ণতালাভ করে বিশ্বমানবতাবোধের ধারণায় এসে। কবিগুরুর সমগ্র মানবিক সত্তাটি গড়ে উঠেছিল জীবন দেবতার ধারণার উপর ভিত্তি করে। এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমাদের আলোক ফেলতে হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনবোধের উন্মেষ কিভাবে ঘটেছে বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই সময়কার চিন্তার গতিস্রোত ও মনের মধ্যকার অন্তর্নিহিত ধারণাগুলিকেও বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

(নারীকণ্ঠ) ঃ একটি বালক জানালা দিয়ে দেখত বাইরের পৃথিবীকে। এই প্রকৃতির অকৃত্রিম উজাড় করা রূপ সৌন্দর্য্য, বিশালতা ভরিয়ে তুলত তাঁর অন্তরকে এক প্রবল বিস্ময়ে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও বিশালতার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে যেত তাঁর অন্তরাত্মা। ঐ দিগন্তের একচিলতে রোদ, আকাশের বুকে উড়ে যাওয়া বকের সারি, কখনো বা মেঘের সমাগম, বৃষ্টির ফল্গুধারা, ফুল, পাখি, সাধারণ মানুষের চলাফেরা, কথা-বলা, দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাশি তাঁর মনে জাগিয়ে তুলত এক অপার বিস্ময় ও কৌতূহল।

"বয়স তখন ছিল কাঁচা-হাল্কা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলো ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিঙ-'পরে ডাকত একা কাক।
ফেরিওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,
তপ্‌সি মাছের ঝুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে—
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় জল ঢালা সব নলে।
অন্ধকারে শোনা যেত রিম্‌ঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথ হারা।

নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,
সব দিয়ে এক হাল্কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,
ভাব্‌নাগুলো তারই মধ্যে ফিরত থাকি থাকি—
বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।"

(বালক ছেলেবেলা শান্তিনিকেতন আষাঢ় ১৩৪০)

সেই মেঘরাশি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রের সমাহার কবিমনে বাল্যাবস্থা থেকেই জন্ম দিয়েছিল অসীমকে জানার, তাকে বোঝার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে।.....

পুরুষকণ্ঠ) ঃ *"আকাশ-ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ"*

(গান, গীতমালিকা ১। প্রকৃতি পর্যায়)

এবং

মহিলাকণ্ঠ) ঃ *"মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে"*

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ রবীন্দ্রনাথের এই বিস্ময়বোধ থেকেই তাঁর দর্শনচিন্তার, আধ্যাত্মিকতার যাত্রা শুরু। শুরু তাঁর জীবনবোধের। মহাবিশ্বে মানুষের স্থল কোথায়? প্রকৃতির এই নিবিড় রহস্য কবি মনে জাগিয়ে তোলে বিস্ময়! এই সমগ্র সৃষ্টিশীলতা, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তীতা, নিরবচ্ছিন্নতা, শৃঙ্খলার পিছনে রহস্য কি? কি সেই নৈর্ব্যক্তিক শক্তি যা সমগ্র বিশ্ব সংসারকে ধারণ করে আছে? সমগ্র সৃষ্টিশীলতাকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে? প্রকৃতির সৃষ্টিশীলতার এই ছন্দেই তো আকাশ, বাতাস, নদনদী মেতে ওঠে.....

"বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী-নদে গিরিগুহা পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গীমা....."

(শতগান, গীতিমাল্য, স্বর ঃ ৩৬, আংশিক স্বরলিপি ঃ কেতকি। শেফালি)

(নারীকণ্ঠ) ঃ প্রকৃতির এই ছন্দ, সঙ্গীত, শৃঙ্খলা, নিয়ম, নিরবচ্ছিন্নতার রূপই কি পরিলক্ষিত হয় না মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেও ? প্রতিদিনকার কর্মের সমষ্টির মধ্যে, মানুষের জীবনের বহু ওঠাপড়ার মধ্যে, সুখ-দুঃখের এই বহু প্রবহমানতার মধ্যেও প্রতিমুহূর্তেই কি প্রকাশিত হয় না সেই এক নৈর্ব্যক্তিক, সমগ্র বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত চেতনসত্তার ? ইনি-ই কি জীবন দেবতা? ইনি-ই ব্রহ্ম?

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরণ কত যে গন্ধ
কত যে রাগিণী কত যে ছন্দ
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন বাসর শয়ন তব—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিতানব।।
আপনি ধরিয়া লয়েছিলে মোরে না জানি কিসের আশে
লেগেছে কি ভালো , হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার নর্ম আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে—
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে?
মানসকুসুম তুলি অঞ্জলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে—
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবনবনে?

(জীবনদেবতা কবিতা। সঞ্চয়িতা)

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ রবীন্দ্রনাথের এই জীবনজিজ্ঞাসা, এই সমগ্রতাকে উপলব্ধির বোধই তাঁর 'ব্যক্তি আমি'র ক্ষুদ্র গণ্ডিকে ছিন্ন করে তাঁকে 'বৃহৎ আমি'কে জানতে সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তিবিশেষ প্রণিধানযুক্ত । "আমি কোন দেবতা সৃষ্টি করে প্রার্থনা করতে পারিনে, নিজের কাছ থেকে নিজের সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি। সে চেষ্টা প্রত্যহ করতে হয়, তা না হলে আবিল হয়ে ওঠে দিন। আর তো সময় নেই, যাবার আগে সেই বড় আমিকেই জীবনে প্রধান করে তুলতে হবে, সেইটেই আমার সাধনা।"

(প্রসঙ্গ কথা গীতাঞ্জলি । সাহিত্য সংসদ)

এই নৈর্ব্যক্তিক শক্তি এক এবং এই 'এক'ই প্রকাশ পাচ্ছে বহুর মধ্যে----এই শক্তি বা ব্রহ্ম রূপের মধ্যেও যেমন প্রকাশমান, অরূপের মধ্যেও তিনি সমানভাবে প্রকাশমান। সেই নিরাকার ব্রহ্ম এক এবং বহুও বটে, এক দৃষ্টিভঙ্গিতে অসীম এবং অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে সসীম।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই তো মধুর।"
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ মেলায়ে উঠে তেমন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর—
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।"

(সীমায় প্রকাশ কবিতা। সঞ্চয়িতা)

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ কবির বাল্যকালের প্রকৃতির স্বরূপের অন্বেষণ, জীবনজিজ্ঞাসা, ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন তার সৃষ্টিশীল, চির কৌতূহল, অন্বেষণ মনকে অশান্ত করে তুলেছিল আরো জানবার, আরো বুঝবার নেশায়। মানুষ যখন প্রকৃতির বিশালতায় নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেয়, তখনই তো প্রকতির রং-এ রাঙিয়ে ওঠে তার হৃদয় । একত্বের বন্ধন যায় ঘুচে একত্র থেকে বহুত্বের ধারণায় সংবদ্ধ হয়ে যায় মানুষের মন। "একম্ সিদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋগ্বেদ)। কবির কণ্ঠ গেয়ে ওঠে প্রকৃতির মঝে মুক্তির গান, জীবনের গান।

"আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
এই আকাশে আমার মুক্তি
ধুলোয় ধুলোয় ঘাসে ঘাসে।।"

(স্বর ঃ ৫, পূজাপর্যায় গান, ৯৯০ পৃঃ ১০২ । গীতবিতান)

(নারীকণ্ঠ) ঃ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রবি ঠাকুরের জীবনবোধের বিকাশসাধন হয়েছিল তাঁর জীবনে এসেছে অসংখ্য মৃত্যু। একে একে চলে গেছেন তাঁর সন্তানরা । একের পর এক আপনজনের মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর খেলার সাথী বউ ঠাকুরাণী, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল এক চরম শূন্যতাবোধকে। এক বিষাদঘন মুহূর্তকে । যে দুঃখ, আঘাত তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে প্রবল মানসিক শক্তির সাহায্যে। জীবন ও মৃত্যুকে সমানভাবে গ্রহণ করার ধারণা থেকেই তিনি আঘাতগুলিকে সহ্য করতে পেরেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যুর (৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৪) পরে প্রথমে যে গানে তাঁর হৃদয়ের প্রকাশ তা হল, 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে'। জীবনের এই চরম আঘাতগুলি থেকেই কি তিনি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতে ব্যগ্র হলেন? জীবনই কি তাঁকে জীবন দেবতার অন্বেষণে ব্যাপৃত করল? সেই এক, অদ্বিতীয়, পরম ব্রহ্ম যাঁর প্রকাশ সর্বভূতে, জীবে, যিনি জন্ম মৃত্যু রহিত, যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়—সেই পরম ব্রহ্মের পাদপদ্মেই কি তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন?

"তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে—
যত দূরে আমি ধাই, কোথাও
দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা
বিচ্ছেদ নাই".....

(গান, ব্রহ্মসঙ্গীত । স্বর ঃ ৪, আনুষ্ঠানিক)

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ জীবন যখন স্তব্ধ হয়ে যায় বেদনার বেদনায় আঘাতে, যখন মন তাঁর নিজস্ব গতিতে চলার ছন্দকে থামিয়ে দেয়, মানুষ তাঁর জীবনীশক্তিকে হারিয়ে ফেলে এবং সমগ্র জীবন অন্ধকারময় হয়ে যায় তখনই তো সেই অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পথে আশাভরসা, বিশ্বাস, ভালোবাসার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দেয় মানুষের নিজ্ঞান মনের স্তরে জমে থাকা ঈশ্বরের ধারণা। অসহায় মানুষ শিশুর মত আঁকড়ে ধরতে চায় কোন সর্বশক্তিমান সত্তাকে। সে মনে করে এই শক্তিই তাকে পথ দেখাবে, বেদনার অন্ধকার ছিন্ন করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আলোর পথের দিকে।.....ভরসা জোগাবে যে জীবন এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

"জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এস।"

(গান, গীতিলিপি, ৫ গীতাঞ্জলিস্বর ঃ ৩৮)

বিধাতা কখন মানবের কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে রিক্ত করে দেয়, আবার কেমন উপহার উজাড় করে দেন। ফুরিয়ে দিয়ে আবার জীবনের পাত্রখানি করুণাধারায় ভরিয়ে দেন। তাঁর লীলা বোঝে —এ সাধ্য কার?

"আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি-ই লীলা তব"

(গীতলেখা ১। গীতাঞ্জলি স্বর ঃ ৩৯)

(নারীকণ্ঠ) ঃ আমরা লক্ষ্য করি এই সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনকে ঘিরে তাঁর দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা, গভীর একাত্মবোধ এবং দুঃখের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত মনটির প্রতিমুহূর্তে জীবন দেবতার অন্বেষণ, জীবনের স্বার্থকতা, তাৎপর্য অনুসন্ধান করার বারংবার প্রয়াস। এই প্রয়াসই তাঁকে বিশ্বমানবতাবোধের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা ও শক্তি যোগাচ্ছিল। যে ব্রহ্মের তিনি উপাসনা করেন, যাঁকে তিনি জীবনের সারসত্তা মানেন তিনি সর্বভূতে পরিব্যপ্ত আছেন—এই বোধ তাঁর মনে জাগিয়ে তুলছিল এই বিশ্ব সংসারকে জানার তীব্র তৃষ্ণাকে।

"হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি।
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া।,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনা সেই আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"

(সঞ্চয়িতা, গীতাঞ্জলি। ভারততীর্থ)

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমানব চেতনার জন্ম তাঁর জীবনদেবতা বা পরম ব্রহ্মের অনুসন্ধান থেকেই। যে পরম ব্রহ্মের প্রকাশ তিনি নিজের মধ্যে দেখেছিলেন, সেই পরম ব্রহ্মকেই সবার মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

(মহিলাকণ্ঠ) ঃ কখনো বা তাঁর মন্ত্রে ধ্বনিত হয় জীবন দেবতার উদ্দেশ্যে কাতর, বিনীত অনুরোধ এবং দীনহীন মানুষগুলির প্রতি তাঁর হৃদয়ের সমবেদনা। এই আশ্বাসবোধ তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্বহারা মানুষগুলির পাশে যেন থাকেন।

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দিন
সেই যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে।।"

(দীনের সঙ্গী কবিতা। সঞ্চয়িতা)

এই প্রসঙ্গে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যের কথা আমরা উত্থাপন করতে

পারি যেখানে আনন্দ প্রখর রৌদ্রে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জলভিক্ষা করে চণ্ডালিকার কাছে। কিন্তু চণ্ডালিকা নিজ পরিচয় দিয়ে ক্ষমাভিক্ষা করে যে সে চণ্ডালকন্যা, তাই জলদানে অপারগ। কিন্তু আনন্দ তাঁকে আশ্বাস দেন যে বিধাতার সন্তান আমরা সবাই। আমাদের পরিচয় মনুষ্যত্বে। এক মানব এক মানবজাতি আমরা তাই এখানে যে মানব চণ্ডালিকা, সেই মানব তপস্বী আনন্দও।

"যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি,
জল দাও আমায় জল দাও।" এই বলে জলপান করে তিনি চণ্ডালিকাকে আশীর্বাদ করেন।

কবির কণ্ঠ গর্জে উঠেছে তেমনই যখন এই সর্বহারা মানুষদের অপমানিত হতে হয়েছে সমাজের কাছে, দেশের কাছে.....

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধূলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।।

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানতার অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে—
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

(অপমানিত। গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা কবিতা,২০শে আষাঢ়, ১৩১৭)

(মহিলাকণ্ঠ) ঃ দেশমাতৃকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের প্রতি তাঁর সুনিবিড় শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মনে.....

"তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে"

(গান। পূজাপর্যায়)

'বসুন্ধরা' কবিতায় পাই, "আমারে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো, বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিস্ফুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিম, শৈবালে শাদ্বলে তৃণে"

(বসুন্ধরা। সঞ্চয়িতা)

আমার 'স্নেহগ্রাস' কবিতায় পাই তাঁর আহ্বান জননীর কাছে .....

"অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি ।
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী।
হে জননী আপনার স্নেহ কারাগারে,
সন্তানের চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা করিয়া শোষণ,
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ?
নিজের সে, বিশ্বে সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।।"

(স্নেহগ্রাস। চৈতালী, সঞ্চয়িতা, ২৫শে চৈত্র, ১৩০২)

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ দেখা যাচ্ছে তাঁর নিজ জননীর ধারণাক্রমে বঙ্গজননীর ধারণায়,বঙ্গ জননী থেকে ভারতজননী এবং শেষ পর্যন্ত ভারতজননী থেকে তা বিশ্বচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে । তাই তো তিনি যে কোনো সন্তান তা বঙ্গদেশের হোক বা ভারবর্ষের... তাকে বিশ্বদেবতার অংশই বলেছেন। প্রতিটি ভারতের সন্তান বিশ্বনাগরিক ...বিশ্বমানব।

যেন জননীর দ্বারে শঙ্খ বেজে উঠেছে.....

তাই তো তিনি বিশ্বমানব সমাজকে আহ্বান করেছেনএই বিশ্বমঞ্চশালায় অংশগ্রহণের জন্য.........

"জননীর দ্বারে আজি ঐ শুনো গো শঙ্খ বাজে"

(ভারততীর্থ। স্বর ঃ ৪৬ পূজাপর্যায়)

বিশ্বকবির কণ্ঠ গেয়ে ওঠে বিশ্ববন্দনের বন্দনা সংগীত। তিনি আহ্বান করেন যাত্রীদের এই বিশ্বমহোৎসবে যোগদান করার জন্য।......

"বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ কর মহোজ্জ্বল আজ হে।
বরপুত্রসংঘ বিরাজ হে।
ঘনতিমির রাত্রির ধরে প্রতীক্ষাপূর্ণ কর' লহ' জ্যোতিদীক্ষা
যাত্রিদল সব সাজ' হে। দিব্যবীণা বাজ হে।
এস কর্মী, এস জ্ঞানী এস, জন কল্যাণধ্যানী,
এস, তাপসরাজ হে।
এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।।"

(আনুষ্ঠানিক সংগীত)

কখনও ধ্বনিত হয় ঐক্যের বার্তা.......

"জগতের পুরোহিত তুমি,
তোমার এ জগৎ মাঝারে—
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি,
গলাগলি অরুণে উষায়।
মেঘ দেখে ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে তোমারি হল জয়।।"

(নারীকণ্ঠ) ঃ বিশ্বকবির বিশ্বমানবতার এই ধারণারই পরিণতিলাভ করেছে তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তিনি শিক্ষাসংস্কৃতির বিকাশসাধন ও প্রসারণের মাধ্যমেই বিশ্ববাসীর কাছে যেমন ভারতবর্ষের ধ্যানধারণা, দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে এক সূত্রে বাঁধতে। জ্ঞানের এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস, জীবনযাপনের রীতিনীতির আদান-প্রদান। কারণ পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমকেই কোনো দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি আরো বেশি সমৃদ্ধশালী হয়। মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতা যায় দূর হয়ে। পারস্পরিক প্রেম, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ঐক্যের বন্ধনে দেশ, জাতি হয়ে ওঠে হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে

পাথেয় করেই ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে প্রথম ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ই পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্"

"Where the whole world finds its one nest !"

"বসুধৈব কুটুম্বকম্"—'সমস্ত বিশ্বই আমাদের আত্মীয় পরিজন'। এই অতিথি পরায়ণতার মনোভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদরবারের কাছে তাঁর আহ্বান বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

(নারীকণ্ঠ) ঃ প্রকৃতির যত নিবিড় সান্নিধ্যে মানুষ আসবে ততই দেশের সীমানা যাবে মুছে। ধর্মের, জাতির, বর্ণের, সামাজিক অবস্থানের, অর্থনৈতিক বৈষম্যের পার্থক্য যাবে ঘুচে এবং তখনই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিমানুষ থেকে বিশ্বনাগরিককে পরিণত হবে। কবির ভাষায় ঃ "On the seashore of endless word's children meet, the infinite sky is motionless overhead and the restless water is boisterous .....on the seashore of endless world's the children meet with shouts and dances".....*(Gitanjali, 173)* বিশ্বকবি জগতের এই আনন্দমঞ্চে যোগদানের আহ্বান শুনেছিলেন এবং তার জন্য তিনি বারংবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বিশ্বদেবতার কাছে। তাঁর নিজের ভাষায় ....."I have had my invitation in this world Festival and thus my life has been blessed . My eyes have seen and my ears have heard.....

(পুরুষকণ্ঠ) ঃ It was my part at this feast to play upon my harp and I have done all I could .....Now, I ask, has the time come at least when I may go in and see thy face and offer thee my silent salutation. *(Gitanjali, page-95)*

(নারীকণ্ঠ) ঃ অতি সংক্ষেপে বিশ্বকবির বিশ্বমানবতাবোধের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

(সমবেতকণ্ঠ) ঃ হে বিশ্ববাসী, সামিল হও এই বিশ্বমহোৎসবে.....জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ চল... পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, দ্বেষ, বিভেদ, অনৈক্য ভুলে সকলে চলে যাই পিতার ভবনে, অমৃত সদনে.....গাহি ঐক্যের গান.....

"আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চল যাই"